ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 488-497
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.036

বাংলা ‘লোকভাষা’-র নানা প্রসঙ্গ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

অদিতি দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 13.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Bengali folk language is an integral part of Bengali folk culture. To comprehend the theoretical identity of Bengali folk language, it is essential to understand the reciprocal relationship between folk culture and folk language. In 1846, William John Thoms introduced the term "folklore," sparking a cultural movement worldwide. Breaking down the word "folklore" yields two components: "folk" and "lore." According to folk culture researchers, "folk" refers to people, while "lore" denotes the traditional, pre-scientific knowledge and life philosophy of these individuals. The Bengali equivalent of "folklore" is "lokoshongskriti" (Folk Culture). Studying folk culture is, in fact, a scientific pursuit, adhering to the principles of social science. Folk culture researchers identify various elements, including oral literature, folk art, festivals, folk religion, folk language, customs, superstitions, and folk science. Focusing on Bengali folk language, an essential component of Bengali folk culture, the term "lokobhasha" (Folk Language) refers to the language of the people. Every individual possesses language and the ability to create it. People can construct an infinite number of sentences using a limited number of words. Despite this, debate surrounds the definition and nature of "lokobhasha." Through our research, we aim to analyze and resolve this debate by exploring the theoretical identity of Bengali folk language.

Keywords: Folk Language, Folklore, Man, Performance, Code Switching.

বাংলা লোকভাষা বাঙালির লোকসংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই বাংলা লোকভাষার তাত্ত্বিক পরিচয়টি জেনে নেবার আগে আমাদের বুঝে নিতে হবে লোকসংস্কৃতি ও লোকভাষার পারস্পরিক সম্পর্ককে। জানা যায় ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়ম জন্ থমস্ ‘ফোক্‌লোর’ শব্দটি প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত এই ‘ফোকলোর’ শব্দটি সেইদিন সমগ্র বিশ্বে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। আমরা ‘ফোকলোর’ শব্দটিকে ভাঙলে দুটি শব্দ পাবো, একটি ‘ফোক’ আর অন্যটি ‘লোর’। লোকসংস্কৃতিবিদদের মতে এই ‘ফোক’ শব্দ বলতে ‘লোক’ অর্থাৎ মানুষজনকে বোঝায় আর ‘লোর’ শব্দ বলতে ঐ মানুষজনের ঐতিহ্যনুগ, প্রাক্ বৈজ্ঞানিক স্তরের লোকজ্ঞানকে যেমন বোঝায় তেমনই অন্যদিকে এই মানুষদের

অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনদর্শন, সৃজনশীল কৃৎকৌশলকেও বোঝায়। ইংরেজি 'ফোকলোর' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বাঙালি লোকসংস্কৃতিবিদগণ 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটি গ্রহণ করেছেন। লোকসংস্কৃতির চর্চা আসলে বিজ্ঞানচর্চা। কেননা এই লোকসংস্কৃতির চর্চা করা হয়ে থাকে সমাজবিজ্ঞানের যথার্থ সূত্রকে অবলম্বন করেই। লোকসংস্কৃতিবিদগণ লোকসংস্কৃতির উপাদান হিসেবে যেগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল মৌখিক শ্রুতিবাহী লোকসাহিত্য, লোকশিল্পকলা, লোকউৎসব, লোকধর্ম, লোকভাষা, লোকাচার, লোকসংস্কার, লোকবিজ্ঞান ইত্যাদি। এখন আমারা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারছি যে বাংলা লোকভাষা বাঙালির লোকসংস্কৃতির একটি উপাদান। 'লোকভাষা' এর 'লোক' শব্দের অর্থ হল 'মানুষ'। প্রত্যেক মানুষেরই ভাষা আছে, ভাষাসৃজন ক্ষমতাও আছে। প্রত্যেকটি মানুষই তার সীমিত সংখ্যক শব্দ দিয়ে অসীম সংখ্যক বাক্য নির্মাণ করতে সক্ষম। কিন্তু তবুও 'লোকভাষা'-র সংজ্ঞা, স্বরূপ নিয়ে যথেষ্ট তর্ক রয়েছে।

ভাষাতাত্ত্বিক রামেশ্বর শ-র মতে যেহেতু লোক-সাধারণের সাহিত্য হল লোকসাহিত্য তাই লোক-সাধারণের ভাষাই হল 'লোকভাষা'। তাঁর মতে আমরা লোক-সাধারণ বলে সমাজের যে স্তরকে বুঝি সেটি আসলে একটি আপেক্ষিক ধারণা। আপেক্ষিক কারণ সমাজের দুই স্তরের মধ্যে লেনদেন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে পারে। তিনি আরও মনে করেছেন আমরা সাহিত্যকে যেমন 'লোকসাহিত্য', 'শিষ্টসাহিত্য' এই দুই ভাগে ভাগ করে নিই তেমনই ভাষাকেও 'লোকভাষা', 'শিষ্টভাষা' এইরকম দুটি ভাগ করে নিতে পারি। যদিও এই ভাগও তাঁর মতে আপেক্ষিক, কেননা এই দুই ভাষার মধ্যেও লেনদেন, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। দুই ভাষার এই আদান-প্রদান একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। আসলে লোকসমাজ আর শিষ্টসমাজ সমাজের দুটি শ্রেণি নয়, সমাজের দুটি স্তর। 'লোক' শব্দের অর্থ খুঁজতে খুঁজতে আমরা যদি অতীতের দিকে পিছিয়ে যায় তবে দেখতে পাবো প্রথমে 'লোক' বলতে সব মানুষকে, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল তিনটি লোককের সঙ্গে সঙ্গে ভুঃ, ভুর্বঃ, স্বরঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য সপ্তলোককেও বোঝানো হত। পরবর্তীতে যখন 'লোক' শব্দের অর্থ সঙ্কোচ ঘটে তখন এই শব্দ নিম্নবর্গের মানুষকে বোঝাতে ব্যবহার করা হত। 'লোক' শব্দের অর্থের সঙ্কোচ সংস্কৃত ভাষাতেই সূচিত হয়েছিল। ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ-র মতে 'লোকভাষা' শব্দের অর্থের এই সঙ্কোচের ফলে পরবর্তীতে এই শব্দের দ্বারা সমাজের অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের ভাষাকে বোঝায়। এই 'লোকভাষা' অনেকটা 'প্রাকৃত ভাষা' তার প্রথম স্তরে যেমন ছিল তেমন আর এইখানে 'প্রকৃতি' বলতে জনগণের ব্যবহার করা ভাষাকে বোঝানো হয়েছে। 'প্রাকৃত ভাষা'র দ্বিতীয় স্তরে যখন 'সাহিত্যিক প্রাকৃত'-র সৃষ্টি হয় তখন এই ভাষা আর নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের ভাষা থাকে না। তাই এখনকার দিনে 'লোকভাষা' বলতে যা বোঝানো হয় তার ধারণা প্রথম স্তরের 'প্রাকৃত ভাষা'র মধ্যেই নিহিত রয়েছে। পাশাপাশি সেই সময় যে ভাষা উচ্চবর্গের শিক্ষিত মানুষের ভাষা ছিল সেই ভাষা ঐ যুগের 'শিষ্ট'-জনের ভাষা অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনীয় ছিল। শিষ্ট ভাষা আর লোকভাষা ভাষার এই দুটি স্তরের ধারণা অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ অর্থাৎ সবযুগেই রয়েছে। আসলে আমাদের সমাজ ব্যবস্থাতেই এই দুটি স্তর সব যুগেই বর্তমান থাকে। 'লোকভাষা' ভাষার প্রাণশক্তির মূল উৎস। এই ভাষা জীবন্ত ভাষার মূলভিত্তি। এই ভাষায় যে অপেক্ষাকৃত অমার্জিত গ্রাম্যতা আর আঞ্চলিক রূপ বৈচিত্র্য থাকে তা উত্তীর্ণ হয়ে ভাষার আদর্শ মান্য রূপটি গঠিত হয়। এই ভাষায় যেমন এককালিক আঞ্চলিক বৈচিত্র্য গড়ে উঠতে দেখা যায় তেমনই কালক্রমিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন-র মতে লোকসাহিত্যের ভাষা আর সাধারণ সাহিত্যের ভাষা বাহ্যিক ভাবে এক কারণ উভয়ের ভাষায় বাংলা। তবুও আমরা লোকসাহিত্যের ভাষাকে 'লোকভাষা' বলে থাকি এই কারণে যে দুটি ভাষা বাংলা হলেও তা সব সময় একই

ছাঁচে গঠিত হয় না। সরাসরি লোকমুখ থেকে কোনরকম পরিবর্তন ছাড়া যদি লোকসাহিত্যের খাঁটি উপাদান সংগ্রহ করা যায় তাহলে সেই 'লোকভাষা' বাংলা ভাষায় কথা বলা প্রত্যেকটি মানুষ বুঝতে নাও পারতে পারে। সুকুমার সেন মনে করেছেন 'লোকভাষা' উপভাষা অনুসারী আর এতে নিভাষারও ছাপ রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানী রামেশ্বর শ এই বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি উপভাষার দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন এক আঞ্চলিক উপভাষা, দুই সামাজিক উপভাষা আর মনে করেছেন যদিও 'লোকভাষা'-য় আঞ্চলিক রূপভেদ আছে তবুও এই ভাষা আসলে সামাজিক উপভাষা।

ভাষাতাত্ত্বিক নির্মল দাশ-এর কথায় 'লোকভাষা' শব্দের অর্থ ব্যঞ্জনা নিয়ে অস্পষ্টতা থাকলেও প্রত্যেক ভাষাতাত্ত্বিকই 'লোকভাষা' বলতে ভাষার একটি বিশেষ রূপভেদের কথায় বলেছেন। তাঁর মতে উপভাষা ভাষার ভগ্নাংশ কেননা ভাষা হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ একক। তাই উপভাষা মর্যাদায় ভাষার চেয়ে ছোটো। বর্তমান সময়ের ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে ভাষা হচ্ছে তাই যার মাধ্যমে সমাজে ভাব-বিনিময়ের একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থার কোনোরকম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব চেহারা পাওয়া না গেলেও যখন সমাজে ভাব-বিনিময়ের জন্য এই ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা হয় তখন এর ব্যবহারিক রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে বিমূর্ত ভাষার এই যে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ রূপটি পাওয়া যাচ্ছে এইটিই হল উপভাষা। উপভাষা-র 'উপ' উপসর্গ এখানে প্রত্যক্ষতার ভাবকেই প্রকাশ করছে। প্রত্যেকটি উপভাষা-র প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী দুটি প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায় এক 'কথ্য' ও অন্যটি 'লেখ্য'। লেখ্য উপভাষার মধ্যে পাওয়া যায় মাত্র একটি অঞ্চল নিরপেক্ষ আদর্শ বা ছাঁচ, অন্যদিকে কথ্য উপভাষা অনেকগুলি অঞ্চলের অনেকগুলি সামাজিক, দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত। তাই লেখ্য উপভাষার চেয়ে কথ্য উপভাষায় বৈচিত্র্য ও সজীবতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কথ্য উপভাষাকে যখন আরও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলেন তখন তাঁরা এর মধ্যে দুটি ভাগ লক্ষ্য করলেন। এই দুটি ভাগের মধ্যে একটি প্রধান দ্বিতীয়টি অপ্রধান। ভাষাবিজ্ঞানীরা দেখলেন কথ্য উপভাষার যে অংশটি সমাজের প্রত্যেক দিনের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত সেখানে সমসাময়িক সময়ের প্রসঙ্গ প্রধান। কথ্য উপভাষার এই অংশটি জনগণের প্রত্যেক দিনের ভাব-বিনিময়ের ভাষা মাধ্যম হওয়ায় ভাষাবিজ্ঞানীরা একে 'জনভাষা' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর কথ্য উপভাষার যে অংশে সমসাময়িক সময়ের পরিবর্তে অতীতের ঐতিহ্যবোধ অর্থাৎ পেছনে ফেলে আসা সামন্ত জীবনের গোষ্ঠীভাবুক পিছু টান বাগ্‌ব্যবহারের মধ্যে স্থান পেয়েছে সেখানে প্রত্যেক দিনের সমসাময়িক সময়ের শব্দভাণ্ডার, বাক্যবন্ধের পরিবর্তে কতগুলি বাঁধাধরা শব্দ, শব্দগুচ্ছ, বাক্যের বিন্যাস গুরুত্ব লাভ করেছে। কথ্য উপভাষার এই অংশে অতীতকে মনে করার ফলে তার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করার ফলে এরমধ্যে নানারকম লোকায়ত প্রবণতা কাজ করে। তাই ভাষাবিজ্ঞানীরা কথ্য উপভাষার এই অংশের নাম দিয়েছেন 'লোকভাষা'। 'জনভাষা' দৈনন্দিনতার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এর সীমা ও পরিধি পূর্বনির্ধারিত থাকে না, এই ভাষার মধ্যে সম্প্রসারণশীলতার সম্ভাবনা রয়ে যায় তাই প্রয়োজন মতো ইচ্ছা মতো বক্তা শব্দভাণ্ডার, বাক্যের বিন্যাস পরিবর্তন করে নিতে পারে। 'জনভাষা' অনেক বেশি মুক্ত ও ব্যক্তি সাপেক্ষ। কিন্তু 'লোকভাষা' ব্যক্তিগত ভাবে ও গোষ্ঠীগত ভাবে অতীত স্মৃতির সূত্রে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তার শব্দভাণ্ডার, বাক্যের বিন্যাসক্রম ইত্যাদি উপাদানগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরিবর্তনীয় রয়ে যায়। 'লোকভাষা'-র মধ্যে যেহেতু যৌথ জীবনের সঙ্কল্প, আশা-আকাঙ্ক্ষা-সংস্কার কাজ করে তাই এই ভাষা প্রথাবদ্ধ ও ঐতিহ্যসাপেক্ষ। সাধারণভাবে প্রথাবদ্ধ হলেও এই ভাষা প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী রূপগত বৈচিত্র্যে ভরপুর। 'লোকভাষা'-র প্রয়োগক্ষেত্রের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় কিছু 'লোকভাষা' সমাজের কতগুলি

লোকাচার ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। এইধরনের 'লোকভাষা'-র দৃষ্টান্ত হল মন্ত্র, ব্রতকথা, বিয়ের ছড়া ইত্যাদি। আবার কিছু 'লোকভাষা' আনুষ্ঠানিকতা বহির্ভূত, এইগুলি শুধুমাত্র মানুষের বাক্ ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত তাই এতে একধরনের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বতঃস্ফূর্ততা দেখতে পাওয়া যায়। এইধরনের 'লোকভাষা'-র দৃষ্টান্ত হল ধাঁধা, প্রবাদ, মেয়েলি ভাষা ইত্যাদি। এতক্ষণ আমরা 'লোকভাষা'-কে কথ্য উপভাষার অংশ হিসেবে জানলাম ঠিকই কিন্তু কথ্য উপভাষা হলেই যে তা 'লোকভাষা' হবে এইরকম মনে করেন না ভাষাবিজ্ঞানীরা। তাঁদের মতে কথ্য উপভাষার কেবলমাত্র যে অংশে লৌকিক বাক্‌ভঙ্গীর ঐতিহ্যগত ছাঁচ থাকবে সেই অংশই 'লোকভাষা' বলে বিবেচ্য, আবার 'লোকভাষা' কথ্য উপভাষা হলেও বক্তার ইচ্ছার অধীন নয় বরং তা লোকায়ত বাক্‌ভঙ্গীর যে ঐতিহ্য রয়েছে সেই ঐতিহ্যের ছাঁচের অধীন। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি 'লোকভাষা' লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। এইখানেও ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেছেন লোকসাহিত্যের বর্ণনা, বিবরণ অংশে যেহেতু বাগ্‌ভঙ্গীর ঐতিহ্যগত ছাঁচের পরিবর্তে ভাষার সাধারণ রীতি অনুসৃত হয় তাই এই অংশকে আমরা 'লোকভাষা'-র অংশ বলতে পারবো না কারণ এখানে এই ভাষার লোকায়ত বাগ্‌ভঙ্গীর ঐতিহ্যগত ছাঁচের বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। যদিও 'লোকভাষা' লোকায়ত ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত তবুও তা গ্রাম, শহর নির্বিশেষে আসলে একটি ভাষাগোষ্ঠীর সর্বজনীন সম্পদ। এই ভাষা প্রাচীন, ঐতিহ্য অনুসারী হলেও জাদুঘরের প্রত্ন সামগ্রীর মতো নয় অর্থাৎ সমকালের জীবন থেকে বিযুক্ত নয়। এই ভাষা সমকালের ভাষাচর্চাকেও সুনির্দিষ্ট মাত্রা দিতেও সক্ষম। এইজন্য ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে 'লোকভাষা' যদিও জন্মসূত্রে পুরাতন তবুও প্রয়োগের দিক থেকে সমসাময়িক জীবনের সমান্তরাল সঙ্গী হয়ে থাকে।

ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদারের কথায় আমরা জানতে পেরেছি ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ্ সোস্যুর আমাদের ভাষাবোধের তিনটি স্তরের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন, এক Langage অর্থাৎ Language, দুই Langue অর্থাৎ Speech আর তিন Parole অর্থাৎ Act of Speaking। Langage-কে মানুষ তার সহজাত সৃজনশীল ক্ষমতারূপে জৈবিক বিবর্তন ধারায় আত্মস্থ করে আর Langue হল ঐ নির্বিশেষ তত্ত্বের মানুষের ঐ সার্বভৌম সৃজনী সামর্থ্যের সবিশেষ প্রকাশ। আসলে Langue হল একটি ভাবনাবিগ্রহ, Langue হল একটি স্মৃতিবাহী পদ্ধতি বিশেষ। এটি কিছু বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের পর পর সঞ্চয়ের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে ব্যক্তির মস্তিষ্কে তৈরি হয়। যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে Langue নির্মিত হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্তি অর্জন করে নিজের সামর্থ্যে এবং বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। ব্যক্তির এই বাচন প্রক্রিয়াকে ফার্দিনান্দ্ সোস্যুর Parole বলে অভিহিত করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন আমরা যদি ভাষার এই তত্ত্বের ব্যাপারে ফার্দিনান্দ্ সোস্যুর-এর পাশাপাশি চমস্কি-র বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাবো তিনি বলেছেন Langue আসলে আমাদের বাচন প্রক্রিয়ার Competence-এর দিকটি প্রকাশ করে এবং অন্যদিকে Parole-এর কাজ হল আমাদের বাচন প্রক্রিয়ার Performance-এর প্রকাশ ঘটানো। সমাজ ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভাষার এই ধারণার সঙ্গে একটি নতুন দিক যুক্ত করতে চান। তাঁদের মতে Langue যেহেতু একটি বিশেষ ভাষাভাষীর উচ্চারণ পদ্ধতি, ঐ ভাষার ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার ইত্যাদি সম্পর্কিত বাচকতার নির্দিষ্ট বিন্যাসের দিকটি প্রকাশ করে তাই Langue-র সামাজিক গুরুত্বকে না মেনে আমাদের উপায় নেই। ভাষিক সম্প্রদায়ের ভাষা তার গোষ্ঠী বা বর্গ বিভেদ, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক ও যোগাযোগ, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সংগঠনের পাশাপাশি তাদের অর্জিত ধ্যান-ধারণার দ্বারা সব সময় নিয়ন্ত্রিত হয়। বাচকতা যেহেতু Langue-র প্রকাশের অর্থাৎ Performance-এর দিকটি উন্মোচন করে তাই এই প্রকাশের সঙ্গে জুড়ে থাকে বক্তা, শ্রোতার সামাজিক সংস্কার। এই বক্তা, শ্রোতার ভাষার আঞ্চলিক ব্যবধান

থাকতে পারে আবার সামাজিক ব্যবধানও থাকতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় পরিবেশ ও প্রসঙ্গ এই আঞ্চলিক ও সামাজিক স্থিতাবস্থার বিচ্যুতি ঘটায়। ফলে একই সামাজিক বক্তা এক একটি পরিস্থিতিতে এক এক ধরনের ভাষা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি হন। ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন এইরকম পরিস্থিতিতে বক্তার Code Switching-এর প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছে Performance কোনো একমুখী প্রক্রিয়া নয় বরং ভাষার ব্যবহারগত প্রকার, ভাষার প্রাসঙ্গিক বা প্রসঙ্গ বহির্ভূত প্রয়োগ বা পরিবেশ অনুযায়ী ভাষার নানাচারী সংকেতধর্মিতা। বাচিক প্রকাশের এই যে সামাজিক দিকটি পাওয়া গেল এইটিকে মনে রেখে আধুনিককালে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রত্যেক ভাষার তিনটি স্তরের কথা মেনে নিয়েছেন এবং ম্যাক ডেভিড্, গ্লিসন্ সমেত অন্যান্য ভাষাবিজ্ঞানীরা এই তিনটি স্তরকে চিহ্নিত করেছেন 'শিষ্টভাষা', 'জনভাষা' ও 'লোকভাষা' হিসেবে। আমরা পূর্বেই এই তিনধরনের ভাষার সম্পর্কে জেনে নিয়েছি।

আমরা ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পেরেছি একটি আঞ্চলিক ভাষার কীভাবে মান্যভাষায় উত্তরণ ঘটে বা একটি মাতৃভাষা থেকে শিষ্টভাষার উত্তরণ সম্ভব হয় এই চলমান প্রক্রিয়াকে, এর আপেক্ষিক তারতম্য নির্ধারণ করতে ভাষাবিজ্ঞানী হগেন্ সবচেয়ে আগে চারটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। এই মানদণ্ডগুলি হল – সূত্রীভবন অর্থাৎ Codification, বিশদীভবন অর্থাৎ Elaboration, নির্বাচন অর্থাৎ Selection, আর সবশেষে স্বীকৃতি অর্থাৎ Acceptance। শিষ্টভাষার সঙ্গে লোকভাষার তারতম্য বোঝার ক্ষেত্রে এই মানদণ্ডগুলি আমাদের সাহায্য করবে। ভাষিক রূপ অথবা উপাদানের সংকোচনশীল ধর্মই হল সূত্রীভবন। এই সূত্রীভবনের ফলে ভাষিক রূপের একমুখীনতা, তার বৈচিত্র্য হ্রাস তৈরি হয়। আসলে অভিধান, ব্যাকরণে যেকোনো ভাষার বৈচিত্র্য এই হ্রস্বতম কাঠামোতে নির্দিষ্ট থাকে। কোনো ভাষাতেই একই রকমের বাচনভঙ্গী কখনই স্থির থাকে না। এই পরিবর্তনের হার অন্যের থেকে কম হলেও কোনোভাবেই স্থিরবিন্দুতে পৌঁছায় না। তাই আদর্শ সূত্রায়িত ভাষা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। সাধারণত জনভাষা, শিষ্টভাষার তুলনায় মান্যভাষায় এই সূত্রায়ণ কিছুটা বেশি। সাধারণ ভাষার মধ্যে যে আঞ্চলিক বা সামাজিক বিভেদ রয়েছে, যে ঔপভাষিক প্রভাব রয়েছে, প্রয়োজন হলে বিদেশী উপাদান আত্মস্থ করার সক্রিয়তা রয়েছে আর রয়েছে আনুষ্ঠানিক বৈচিত্র্য এই সমস্ত কিছুকে বিশ্লেষণ করে একটি স্থির আদর্শে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা ভাষার ক্ষেত্রে সবসময় চলতেই থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় জনভাষার সূত্রায়ণ প্রক্রিয়া একদিকে শিষ্টভাষার অভিমুখী হলেও কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা লোকভাষা অভিমুখীও বটে। ভাষার সম্প্রসারণশীল ধর্ম হল বিশদীভবন। আসলে কোনো ভাষায় স্থাণু অবয়বমাত্র নয়। তাই আঞ্চলিক উপভাষাতে টানাপোড়েন চলতেই থাকে, কখনও প্রয়োজন হলে বিভিন্ন ভাষিক স্তরের উপাদান গৃহীত হয় আবার কখনও বিদেশী ভাষার প্রভাবে নতুন শব্দ তৈরির কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। আবার এই আঞ্চলিক উপভাষা লিখন পদ্ধতির সাহায্যে শব্দভাণ্ডারের অফুরান ভাণ্ডার নির্মাণ করতেও সক্ষম সর্বোপরি সরকার চাইলে এই ভাষাকে অধিক গুরুত্বও দিতে পারে। ভাষার এই সম্প্রসারণশীল ক্রিয়াশীলতাই হল বিশদীভবন। ক্রিয়াশীলতাকে মানদণ্ড করে ভাষাবিজ্ঞানী বের্নস্টাইন ভাষার ভাষিক প্রতীককে Elaborated Code অর্থাৎ বিশদ প্রতীক আর Restricted Code অর্থাৎ সংকীর্ণ প্রতীক এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একদিকে যেমন বিশদ প্রতীকের গ্রহণযোগ্য অর্জন ক্ষমতা বহুমুখী এবং প্রসারণধর্মী সেখানে অন্যদিকে সংকীর্ণ প্রতীকের আবেদন হল সবিশেষে ও অনেকবেশি প্রসঙ্গবদ্ধ সেইসঙ্গে এর ব্যবহার ব্যক্তি আশ্রয়ী।

এতক্ষণ ধরে আমরা সূত্রীভবন আর বিশদীভবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে জানলাম। এবার আমরা এই দুটি প্রক্রিয়ার মানদণ্ড গ্রহণ করে শিষ্টভাষা আর লোকভাষার মধ্যের প্রভেদগুলি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো। ভাষাতাত্ত্বিক পরেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেছেন ভাষিক স্তর উন্নয়নের ঊর্ধ্বযাত্রায় শিষ্টভাষা লোকভাষার থেকে একটি পর্যায় এগিয়ে রয়েছে। তাঁর মতে আমাদের এই অগ্রগতি বিচার করতে হবে সূত্রীভবন আর বিশদীভবনের আপেক্ষিক তারতম্যের বিচারের মধ্যে দিয়ে। আমরা যদি আদর্শায়নের মাপকাঠি অনুযায়ী ভাবি আর শিষ্টভাষাকে উচ্চতর ও লোকভাষাকে নিম্নতর সোপান বলে মনে করি তবে দেখতে পাবো প্রত্যেকটি ভাষার স্তরেই সূত্রায়ণ প্রক্রিয়া সমান ভাবে সক্রিয় থাকলেও ক্রিয়াশীলতার বিচারে শিষ্টভাষায় বিশদীভবন যেখানে একটু বেশি সেখানে লোকভাষায় তা অপেক্ষাকৃত কম। এইজন্য শিষ্টভাষায় ভাষিক উপাদানে ক্রিয়াশীলতা বহিঃপ্রকাশিত, মুক্ত হলেও লোকভাষায় তা বদ্ধ। আবার লোকভাষায় ভাষিক প্রতীক যেখানে সংকীর্ণ সেখানে শিষ্টভাষায় তা অনেকবেশি সম্প্রসারিত। শিষ্টভাষার ভাষিক প্রতীকগুলিতে যেখানে যথেচ্ছ পরিবর্তনের বীজ লুকিয়ে আছে সেখানে লোকভাষার শাব্দিক উপাদানে এই নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায় না।

এবার আমরা নির্বাচন আর স্বীকৃতি এই দুটি বিষয়ে আলোকপাত করবার চেষ্টা করবো। নির্বাচন হল সামাজিক স্বীকৃতির গোড়ার কথা। ভাষার মধ্যে থাকা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভেদগুলির মধ্যে যদি কোন একটি ভেদ নির্বাচিত আদর্শরূপে সকলের মান্যতা পাই তখন তাকে শিষ্টভাষা বলে অভিহিত করা হয়। এই আদর্শায়নের পেছনে থাকতে পারে ঐতিহাসিক কারণ, থাকতে পারে সম্ভ্রান্ত মানুষের পদমর্যাদা। কিন্তু যদি এই নির্বাচন প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়, বিশেষ করে যখন কোনো ভাষাভাষী নিজেকে এর থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে তখন এই প্রতিরোধকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক অথবা সাংস্কৃতিক সংহতি গড়ে ওঠে। আসলে লোকভাষা এই সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের প্রকাশ মাধ্যম। এই ব্যাপারে শিষ্টভাষা ও লোকভাষার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। মূলত এই ক্ষেত্রে দেখা যায় শিষ্টভাষায় কথা বলা ব্যক্তিদের সামাজিক প্রতিপত্তির বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা হিসেবেই লোকভাষীদের সংহতি গড়ে ওঠে। এই সংহতির বন্ধন দৃঢ় না হলেও ভাষার মধ্যে ফুটে ওঠে বিচ্ছিন্নতাধর্ম। এই জন্য লোকভাষার উপাদান নির্বাচন সাপেক্ষ হলেও প্রতিক্রিয়াধর্মী। ফলে শিষ্টভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগ থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে লোকসাহিত্যের ভাষার মধ্যে এক বিশেষধরনের নির্বাচনধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে আমরা যদি শিষ্টভাষার স্বীকৃতির দিকটি লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাবো যেহেতু এই ভাষা পরিশীলিত সমাজের গণ্যমান্য মানুষের কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে ওঠে তাই তা প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য। এই ভাষা অর্জন করতে হয় বিশেষ শিক্ষা প্রণালীর সাহায্যে। এই ভাষার আবেদনও শিক্ষিত জনগণের সচেতন প্রয়াসে পুষ্ট। স্বীকৃতির প্রসঙ্গে লোকভাষা কেবল একটি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক স্তরের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। এই ভাষার প্রতীক সংকীর্ণ এই কারণে যে তা গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সূত্রে আবদ্ধ। এটি তাদের সামাজিক অবচেতন ধারণায় আগে থেকেই অন্তর্লীন থাকে।

আমরা দেখতে পাই নানা কারণে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় অথবা উপজাতির মধ্যে যেহেতু লোকভাষা ধারাবাহিক সূত্রে জীবিত থাকে তাই সমাজ-ভাষাবিজ্ঞান অনুযায়ী লোকভাষাও একধরনের সমাজ উপভাষা। লোকভাষা মাঝে মাঝে কখনও শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে আবার কখনও মান্যভাষার চাপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও একদিকে লোকভাষাভাষীদের সমাজ আনুগত্য আর অন্যদিকে গোষ্ঠীসত্তা তাদের জীবনবোধের সংঘবদ্ধতার কারণে এই ভাষা উচ্চতর সমাজের পরিশীলিত সামর্থ্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তুলতে

সক্ষম। তাই এই ভাষার গোষ্ঠী অনুভব ভাষিক ঐক্য গড়ে তোলে যত না তার থেকে বেশি সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলে। তাই লোকভাষার Unit আসলে সমাজগত, ভাষাগত নয়। আলোচনার এই সূত্র ধরে আমরা উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার কিছু পার্থক্য জেনে নেবার চেষ্টা করবো। উপভাষা ও লোকভাষার পার্থক্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রথমেই আমাদের চোখে যে বিষয়টি পড়ে তা হল ভাষিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপভাষার আঞ্চলিক গণ্ডী থাকলেও লোকভাষার এইধরনের কোনো গণ্ডীবদ্ধতা নেই। এর পরিবর্তে লোকভাষায় সামাজিক প্রসার লক্ষ্য করা যায়। লোকভাষার এই সামাজিক প্রসার যেমন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীচেতনা পুষ্ট তেমনই সামাজিক শাসন ও অনুশাসনে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল উপভাষার একটি ব্যক্তিক রূপ থাকলেও লোকভাষার ক্ষেত্রে এইরকম কোনো ব্যক্তিক রূপ থাকতে পারে না। লোকভাষায় যদি তা থেকে থাকে তবে তা উপভাষাগত উপাদানের পরিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। উপভাষার ব্যক্তিক রূপকে বলা হয় নিভাষা বা Idiolect। এরফলে কোনো বিশেষ ভাষাভাষী আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব মেনে নিলেও তার নিজের ভাষিক বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এবং এমনকি তার দীর্ঘ জীবনে এই বিষয়টির পরিবর্তনও ঘটতে পারে। তৃতীয় যে বিষয়টির উল্লেখ করবো তাহল সামাজিক স্তরে উপভাষার কোনো মর্যাদা না থাকলেও কোনো কোনো উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার আপতিক যোগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আমাদের এই কথা ভুললে চলবে না যে ভাষার ক্রমস্তরীয় বিন্যাসের দিক থেকে লোকভাষা উপভাষার থেকে এক ধাপ নীচে অবস্থান করে। আসলে আঞ্চলিক ভাষার মধ্যের ব্যাপ্তি ও প্রসার কখনই একই অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। মাঝে মাঝে এমন ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় যে অধস্তলের ভাষার চলমানতা প্রবল বিরুদ্ধতার পড়েও ঊর্ধ্বমুখী হতে সক্ষম হয়। যার ফলে উপরিতলের ভাষায় মধ্যে উক্ত লোকভাষার প্রভাব মিশে গেলেও যেতে পারে কিন্তু তা আসলে চূর্ণস্মৃতি (Relics) হিসেবেই থাকে। অন্যদিকে আরও একটি ঘটনা ঘটতে দেখা যায় যেখানে প্রতি মুহূর্তে উচ্চবর্গের ভাষার চাপে নিম্নবর্গের লোকভাষার মধ্যের উপাদানগুলি ক্রমশই লুপ্ত হতে থাকে। আবার লোকসাহিত্যে যেমন ইংরেজি শব্দের ক্রমাগত প্রসার ঘটতে দেখা যায় তেমন উপভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু এতখানি বিষমধর্মী প্রতিপক্ষতা লক্ষ্য করা যায় না। উপভাষা ও ভাষাভেদগুলির মধ্যের এই চলমান ধর্ম আসলে পারস্পরিক এবং ভাষিক সংকেতগুলি হল জীবন্ত। এইজন্য এদের প্রভাব উভয়মুখী এবং উভয়ত গ্রহণমুখী। চতুর্থ যে বিষয়টি উপভাষা ও লোকভাষার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, লোকভাষার মধ্যে উপভাষার চলমানতার সবগুলি ধর্ম স্পষ্ট নয়। উপভাষার চলমানতা নির্ভর করে চারটি প্রবণতার কমবেশি তারতম্যের উপর, এই চারটি প্রবণতা হল মান্যায়ন (Standardisation), স্বয়ংভরতা (Autonomy), ঐতিহাসিকতা (Historicity) এবং সজীবতা (Vitality)। মূলত মান্যায়ন-বিরোধী প্রতিক্রিয়ার তাগিদে লোকভাষাভাষীরা নিজেদের ঐতিহ্যপুষ্ট ভাষাবিধিকে আঁকড়ে থাকার প্রয়াস চালিয়ে যায়। লোকসমাজের অনেক অবচেতন স্মৃতিই লোকভাষায় ধরা না পড়ায় এর ভাষিক কাঠামো অসম্পূর্ণ এবং অসংলগ্ন হয়, তাই এই কারণে লোকভাষাকে 'স্বয়ংভর' ভাষা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়। অন্যদিকে লোকভাষার বাচন-প্রক্রিয়াও বিশেষ কোনো মাধ্যমকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে। আমরা এইরকম দৃষ্টান্ত দেখতে পাই ধাঁধা, ছড়া, লোককথা জাতীয় লোকসাহিত্যের মধ্যে।

এইবার আমরা বাংলা লোকসাহিত্যের ভাষা-ভাবনা সম্পর্কে জেনে নেবার চেষ্টা করবো। লোকসাহিত্যের ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করা হলেও তা সমাজ নিরাসক্ত হতে বাধ্য। এই কারণে লোকভাষাবিদদের কাজ হল এই ভাষার গভীরে যে লোক-অভিজ্ঞতা, সামাজিক প্রতিবেশ এবং সাংস্কৃতিক

উত্তরাধিকারীরা অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়েছে তাদের পুনরুদ্‌ঘাটন ঘটানো। এটি করতে গেলে তাঁদের লোকসাহিত্য থেকে প্রথমেই উদ্ধার করতে হবে লোকভাষার মধ্যে লুকিয়ে থাকা গুড় ভগ্নাংশগুলিকে এবং একই সঙ্গে আবিষ্কার করতে হবে লোকভাষার Unit-গুলিকেও। লোকভাষার Unit-গুলিকে বলা হয় Motif বা অভিপ্রায় আর এই ভাষিক প্রকরণগুলি হল Folk-register বা লোকপ্রকরণ। আমারা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো, যদি আমরা একটি বিশেষ Motif হিসেবে নিদ্রা-উদ্রেককারী নিদ্রাদেবীর মূর্ত ধারণা পাই তবে Folk-register বা লোকপ্রকরণ হিসেবে পাবো 'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি অথবা ঘুমনি মাসি ঘুমনি পিসি অথবা নিদ্রালি মা' জাতীয় ভাষিক Code বা সংকেতগুলিকে। এর মূল কারণ হল এদের ব্যবহার-বিধি সুনির্দিষ্ট আর এগুলি ছড়াতেই বিশেষ করে ব্যবহৃত হয়েছে। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের অন্যান্য সম্পর্কের দিক হল লোকভাষার সংজ্ঞাপন প্রক্রিয়ার বা Communicative Process-এর আরও একটি দিক। এক্ষেত্রে সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেকগুলি পরিস্থিতির সম্ভাবনাকে লক্ষ্য করেছেন। ভাষা কেবলমাত্র প্রতিবেদন নয়, এর যে প্রয়োগগত প্রতিবেশ আছে তা আমরা বুঝতে পারি ভাষাভাষীদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে। এক্ষেত্রে লিঙ্গ, ধর্ম, ঐতিহ্য ও প্রথা, বয়স, বৃত্তি, ঔপজাতিক বন্ধন ইত্যাদি যেমন আছে তেমন আঞ্চলিক সমাজবন্ধনও আছে। একই ভাবে লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সামাজিক সংযোগের ফলে লোকসাহিত্যে অনেকগুলি বিভাগ চিহ্নিত হয়েছে, যেমন - লিঙ্গধারণা শাসিত মেয়েলি ছড়া, ব্রতকথা, আঞ্চলিকতাধর্মী মৈমনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্গ গীতিকা ইত্যাদি। আমাদের একথা স্বীকার করতেই হয় যে বাংলা লোকসাহিত্যে এই সমাজবন্ধন-নির্ভর যৌথ আবেগের ফলেই অনেক ধরনের Folk-register বা লোকপ্রকরণ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা লোকসাহিত্যের ভাষার সাধারণ প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা এইবার জেনে নেবার চেষ্টা করবো। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলা লোকসাহিত্যের ভাষার চারটি বিভাগ অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও শব্দভাণ্ডারের মধ্যে বাক্যরীতি ও শব্দভাণ্ডারের আলোচনায় প্রধান হওয়া উচিত কারণ লোকসাহিত্যের ভিত্তি আঞ্চলিক হওয়ায় এতে যেমন ধ্বনিতত্ত্বগত বিভেদ বৈচিত্র্য থাকা স্বাভাবিক তেমনই রূপতত্ত্বগত সরলতা অর্জনের প্রবণতা থাকাও স্বাভাবিক। লোকসাহিত্যের ভাষায় বাক্যরীতি ও শব্দ ভাণ্ডারের পরিবর্তন হল দ্বিমাত্রিক, এক আঞ্চলিক আর দুই সমাজ মনস্তাত্ত্বিক। আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে 'সমাজ' বলতে লোকসমাজের কথায় বলা হয়েছে। আবার লোকসাহিত্যের ভাষা প্রধানত কথ্য ভাষাভঙ্গিকেই অবলম্বন করে থাকে। এই ভাষা চলমান জীবনের সঙ্গে সংগতি রেখে খুব সহজেই পাল্টে যায়। এছাড়াও নিজস্ব শক্তিবলে এই ভাষা অর্জন করে নেয় নানা উপাদান, যেমন- অর্ধতৎসম শব্দ, ধ্বন্যাত্মক বা অনুকারবাচক শব্দ। এই ভাষায় অতীতের শব্দসম্ভার অথবা ব্যাকরণিক প্রয়োগ অল্প পাওয়া গেলেও তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। উপভাষা আর লোকভাষা এক অর্থে ব্যবহৃত না হলেও কথ্য ভাষারীতিকে আশ্রয় করার জন্য বাংলার নানা অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে লোকভাষার একটা যোগ অনুভব করা সম্ভব হয়। যদিও আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে লোকভাষার গভীর যোগ রয়েছে তবুও এই ভাষায় লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির প্রভাব সক্রিয়ভাবে কাজ করে। মূলত এই ভাষা শুধুমাত্র সমাজ আশ্রয়ী নয়, এটি একটি সামাজিক ক্রিয়াশীলতাও। তাই লোকসংস্কৃতিবিদ্‌গণ লোকভাষার ক্রিয়াশীলতা বিচারের ক্ষেত্রে নিষেধ (Tabu), সংস্কার (Superstition), লোকনিরুক্ত (Folk-etymology) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেক সময় ভাষার অবয়ব ও সমাজের সাংগঠনিক রূপের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক স্পষ্ট হওয়ায় লোকসাহিত্যের ভাষায় একদিকে যেমন আঞ্চলিক লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় তেমন অন্যদিকে

জাতি-ধর্ম-লিঙ্গ-বৃত্তি ইত্যাদি জনিত সামাজিক পার্থক্যও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইদিক থেকে দেখতে গেলে লোকভাষায় আঞ্চলিক ও বিশেষ সমাজ আশ্রিত গণ্ডীবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে লোকসাহিত্যের ভাষায় একটি নির্বিশেষ ও সেই সঙ্গে সার্বিক সংকল্প ফুটে ওঠে। এই কারণেই এর ভাষা শুধুমাত্র Dialectal বা Sociolectal নয় বরং তা Universal-ও। আসলে লোকভাষা যদিও একটি বিশেষ সম্প্রদায় অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত তবুও এই ভাষার মধ্যে একটি সর্বজনীন মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠতে দেখতে পাওয়া যায় যা এই ভাষাকে বিশ্বজনীন লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। লোকসাহিত্যের ভাষায় লোকভাষার উপাদানগুলি চিহ্নিত করবার জন্য লোকপ্রকরণই হবে মূল Unit। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই জাতীয় লোকপ্রকরণে অবশ্যই লোকভাষা সম্পর্কিত নানান বিষয় যেমন ভাষিক উপাদান, অর্থগত তাৎপর্য এবং সামাজিক অন্বয় অবশ্যই অন্যোন্য নির্ভর হয়ে থাকবে। লোকসাহিত্যের ভাষিক সংকেতে যাই পরিবর্তন ঘটুক না কেন তা যথার্থ লোকপ্রকরণ হয়ে উঠতে গেলে কিছু শর্ত মানতে হয়। এই শর্তগুলি হল— অবশ্যই ভাষিক উপাদানে লোকভাবনা ও সমাজসংস্কার এবং সেই সঙ্গে সমাজ মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট ভাবে থাকা চাই। আবার জনভাষায় ব্যবহৃত কোড্‌গুলির সাথে লোকভাষার কোড্‌গুলির সমান্তরাল, বিকল্প প্রয়োগে যেমন ক্রিয়াশীল বৈপরীত্য সৃষ্টি করে তেমন কোডের স্থানচ্যুতি লোকমানসে প্রতক্রিয়া সৃষ্টি করে সংজ্ঞাপনের মূল্যমানও নির্ধারণ করে। অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় লোকভাষার উপাদানগুলি শিষ্ট বা মান্যভাষায় তেমনভাবে স্বীকৃতি পাই না। মাঝে মাঝে প্রয়োগের দিক থেকে এই ভাষা 'অপভাষা' হিসেবে মান্য বা শিষ্ট ভাষায় চিহ্নিত হয়। লোকসাহিত্যে লোকভাষিক উপাদানগুলির বিন্যাসগত সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত লোকসাহিত্যের একইধরনের আদর্শগুলির তুলনা করলেই আমরা দেখতে পাই এই ধরনের বাচিক প্রকাশ অনেক বারই পুনরুক্ত হচ্ছে।

সর্বোপরি লোকভাষা একটি ভাষা ঠিকই কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেছেন এটি কোনো পূর্ণাঙ্গ ভাষা নয়। তাঁরা এটিকে চিহ্নভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। এইজন্য শিষ্টভাষা, জনভাষার মতো লোকভাষার সামগ্রিক ব্যাকরণ কাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কিছু চূর্ণ বিক্ষিপ্ত উপাদানের মধ্যে দিয়ে লোকভাষার প্রকাশ। কতগুলি বিশিষ্ট শব্দাবলী, কিছু পদগুচ্ছ, কিছু বাক্যরীতি আশ্রিত রূপবন্ধ দেখে লোকভাষার ক্রিয়াশীলতা নির্ধারণ করতে হয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে Performance স্তরে নয় পরিবর্তে Competence স্তরেই এই ভাষার যথার্থ স্বরূপ নিহিত আছে। মূল কথা হল ক্রমিক সূত্রায়ণ অর্থাৎ Codification লোকভাষাকে একটি বিশেষ সাংকেতিক অবয়বে চিহ্নিত করেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। চাকলাদার, স্নেহময়, 'ভারতের ভাষা সমস্যা ও রাষ্ট্রনীতি', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৮১।

২। চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (মুখ্য সম্পাদক), বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুমহান, চক্রবর্তী, ড. কোয়েল (সহযোগী সম্পাদক), বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, দে বুক স্টোর, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, জুন, ২০১৯।

৩। চক্রবর্তী, শ্রী বরুণকুমার ও অন্যান্য (সম্পাদকমণ্ডলী), 'লোকভাষার নানা দিগন্ত', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১৯।

৪। চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীতিকুমার, 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ১৯৯৬।

৫। চৌধুরী, ড. দুলাল, সেনগুপ্ত, ড. পল্লব (সম্পাদক), 'লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংযোজন, ২০১৩।
৬। দাশ, ড. নির্মল, 'লোকভাষা থেকে ভাষালোক', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১০।
৭। দাশ, শিশিরকুমার, 'ভাষাজিজ্ঞাসা', প্যাপিরাস, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪।
৮। নাথ, মৃণাল (সম্পাদনা), 'ভাষা', এবং মুশায়েরা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০১৮।
৯। নাথ, মৃণাল, 'ভাষা ও সমাজ', নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৯।
১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), 'বাঙলায় সমাজভাষাচর্চা', নির্ঝর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০২২।
১১। মিত্র, শ্রীসনৎকুমার (সম্পাদিত), 'বাঙলা লোকভাষা বিজ্ঞান', লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০১।
১২। সরকার, পবিত্র, 'লোকভাষা লোকসংস্কৃতি', চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৩।
১৩। হালদার, গোপাল, 'ভারতের ভাষা', মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১। বসু, ব্রাত্য (প্রধান সম্পাদক), 'শিক্ষা দর্পণ', প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২৩।